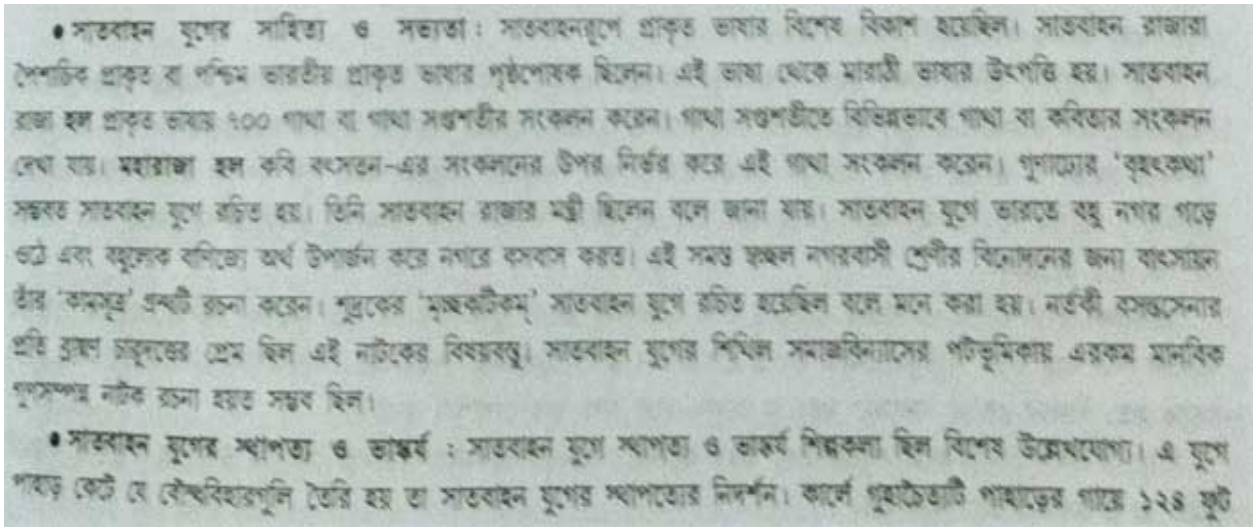

• **সাতবাহন যুগের সাহিত্য ও সভ্যতা**: সাতবাহনযুগে প্রাকৃত ভাষার বিশেষ বিকাশ হয়েছিল। সাতবাহন রাজারা পৈশাচিক প্রাকৃত বা পশ্চিম ভারতীয় প্রাকৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই ভাষা থেকে মারাঠী ভাষার উৎপত্তি হয়। সাতবাহন রাজা **হাল** প্রাকৃত ভাষায় ৭০০ গাথা বা গাথা সপ্তশতীর সংকলন করেন। গাথা সপ্তশতীতে বিভিন্নভাবে গাথা বা কবিতার সংকলন দেখা যায়। **মহারাজা হাল** কবি বৎসসেন-এর সংকলনের উপর নির্ভর করে এই গাথা সংকলন করেন। গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' সম্ভবত সাতবাহন যুগে রচিত হয়। তিনি সাতবাহন রাজার মন্ত্রী ছিলেন বলে জানা যায়। সাতবাহন যুগে ভারতে বহু নগর গড়ে ওঠে এবং বহুলোক বাণিজ্যে অর্থ উপার্জন করে নগরে বসবাস করত। এই সমস্ত স্বচ্ছল নগরবাসী শ্রেণীর বিনোদনের জন্য বাৎস্যায়ন তাঁর 'কামসূত্র' গ্রন্থটি রচনা করেন। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্' সাতবাহন যুগে রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। নর্তকী বসন্তসেনার প্রতি ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রেম ছিল এই নাটকের বিষয়বস্তু। সাতবাহন যুগের শিথিল সমাজবিন্যাসের পটভূমিকায় এরকম মানবিক গুণসম্পন্ন নাটক রচনা হয়ত সম্ভব ছিল।

• **সাতবাহন যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য** : সাতবাহন যুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পকলা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ যুগে পাহাড় কেটে যে বৌদ্ধবিহারগুলি তৈরি হয় তা সাতবাহন যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন। কার্লে গুহাচৈত্যটি পাহাড়ের গায়ে ১২৪ ফুট

গর্ত করে তৈরি করেছিলেন। নাসিক, কল্যাণ ও আরও নানাস্থানে সাতবাহন যুগে বৌদ্ধগুহা তৈরি করা হয়, যার মধ্যে অজন্তা, পিতলখোরার গুহা বিখ্যাত। সাতবাহন যুগে পূর্বে দক্ষিণাত্যে অমরাবতী অঞ্চলে বহু স্তূপ তৈরি হয়। এ যুগে গ্রাম ও নগরকেন্দ্রিক বিহারের স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অমরাবতীর স্তূপগুলির ভাস্কর্য অত্যন্ত বিখ্যাত। পার্থিবতা ও ইন্দ্রিয়তা অতিক্রম করে এই ভাস্কর্য এক আধ্যাত্মিক চরিত্র লাভ করেছিল।

• **সাতবাহন যুগের অর্থনৈতিক অবস্থান ও বাণিজ্য :** সাতবাহন যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পশ্চাতে এক দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের মাধ্যমে সাতবাহন অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল। এই যুগে লাঙলের সাহায্যে চাষ-আবাদ ও জলসেচের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পুলুমায়ির রাজত্বকালে জনৈক গৃহপতি একটি জলাধার নির্মাণ করেন। কৃষির উন্নতির ফলে সামন্তপ্রথার উদ্ভব ঘটে। মহারথী, মহাভোজ, মহাসেনাপতিরা ছিল সামন্ত শ্রেণীর লোক। তারা শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করত এবং সেনাদল পরিচালনা করত।

সাতবাহন যুগে কৃষিকাজ জনসাধারণের একমাত্র জীবিকা ছিল না। এইযুগে শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। চামড়া, কাপড়, কাঁচ, লোহা, পাথর ও অন্যান্য শৌখিন শিল্পের প্রসার ঘটেছিল। নাগরিক জীবনের সমৃদ্ধি ও বিলাস এই শিল্পের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। সমাজে শ্রেষ্ঠি বা গিল্ড প্রধানের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। শিল্পী কারিগরদের গিল্ড বা সংঘ থাকত। শিল্পের পাশাপাশি বাণিজ্য ও উপনিবেশের বিস্তার ঘটে। সমাজে বণিক শ্রেণির প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে সামন্তশ্রেণী তাদের একাধিপত্য হারায়। বাসোপযোগী রচনায় তার প্রতিফলন দেখা যায়।

সাতবাহন যুগে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে মালবের উজ্জয়িনী, অন্ধ্রের ধান্যকটক, পশ্চিম অঞ্চলের প্রতিষ্ঠান, নাসিক ও গোবর্ধন, মহীশূরের বনবাসী, টগর ও নতুন শহর বেনাকটক উল্লেখযোগ্য ছিল। এই শহরগুলি বিভিন্ন রাস্তার মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। দক্ষিণাত্যে অনাবাদী অরণ্য অঞ্চল পরিষ্কার করে গ্রাম ও শহর গড়ে ওঠায় অন্তর্বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়।

সাতবাহন যুগে বহির্বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের পশ্চাতে কয়েকটি কারণ ছিল—

(ক) সাতবাহন সাম্রাজ্যের শান্তি ও সংহতির ফলে বাণিজ্যে উন্নতি দেখা দেয়।

(খ) দক্ষিণাত্যের পূর্বভাগে কৃষ্ণা, গোদাবরী উপত্যকায় সাতবাহন শক্তির বিস্তারের ফলে বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়।

(গ) বাণিজ্য বিস্তারের অন্যতম কারণ ছিল আর্য সংস্কৃতির প্রচার ও উপনিবেশন স্থাপন।

(ঘ) মশলা, চন্দনকাঠ, কর্পূর প্রভৃতি দ্রব্য রোমে রপ্তানি করে সেখান থেকে সোনা আমদানির আগ্রহ বাণিজ্য বৃদ্ধির কারণ ছিল। সাতবাহন যুগে প্রধান বাণিজ্য চলত পশ্চিম উপকূলে ভৃগুকচ্ছ বা ব্রোচ বন্দর থেকে। এই বন্দর থেকেই সাতবাহন সম্রাটের দূত রোমান সম্রাট আগাস্টসের সভায় খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে গিয়েছিল বলে জানা যায়। ব্রোচ বন্দর থেকে সমুদ্রপথে আরব সাগর ও লোহিত সাগর হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া বা রোম সাম্রাজ্যের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র পর্যন্ত এই বাণিজ্য চলত। মৌসুমি বায়ুর গতিপথ আবিষ্কৃত হওয়ায় রোমান জাহাজগুলি গভীর সমুদ্র দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথে ব্রোচ ও সোপর্ণ বন্দরে আসত। রোম-ভারত বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় রোমের স্বর্ণমুদ্রা বেশিরভাগ ভারতে চলে আসত। নাসিক, কার্লে, কানহেরির লিপি থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। কোলাপুর ও পণ্ডিচেরীতে রোমান বাণিজ্যিক দ্রব্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। এছাড়া ছিল সোপ্রা এবং কল্যাণ বন্দর। এইগুলি অন্তর্বন্দর নাসিক, পৈঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। মালাবার উপকূলে মিমলিক ছিল বিখ্যাত বন্দর। সেখান থেকে মশলা, চন্দনকাঠ, হাতির দাঁত, কচ্ছপ, সরু চাল, সুগন্ধী মশলা, কর্পূর প্রভৃতি রোমান সাম্রাজ্যে রপ্তানি হত এবং তার বিনিময়ে আসত সোনা। সোপ্রা ও কল্যাণ থেকে দেশের অভ্যন্তরে যে বাণিজ্যপথ ছিল তার ধারেই তৈরি হয়েছিল বৌদ্ধবিহার, স্তূপ ও গুহাগুলি। বিহারগুলি সম্ভবত বাণিজ্যে উৎসাহ দিত এবং অনেক সময় অর্থ বিনিয়োগ করত।

পূর্ব উপকূলের বাণিজ্য বন্দর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য চলত এবং পণ্যগুলি উপনিবেশে ছড়িয়ে পড়ত। বাংলার তাম্রলিপ্ত থেকে করমণ্ডল উপকূল ধরে বিভিন্ন বন্দর স্থাপিত হয়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যে মশলার সরবরাহের জন্য পূর্ব উপকূলের বণিকরা সুমাত্রা ও জাভায় মশলা আমদানি করত। তাছাড়া আর্য সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য পূর্ব উপকূল থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপিত হয়। টলেমীর রচনা থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে দাক্ষিণাত্য ও পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

সাতবাহন যুগে বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসারের ফলে গিল্ডগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এ যুগে মৃৎশিল্প, চর্মশিল্প, ধাতুশিল্প প্রভৃতি আলাদা গিল্ড গড়ে ওঠে। গিল্ডগুলি থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের মান ও দাম ঠিক করে দেওয়া হত। গিল্ডের সদস্যদের গিল্ডের নিয়ম মেনে চলতে হত। গিল্ডের কোনো সদস্যের মৃত্যু বা অসুখ হলে গিল্ড তার দেখাশুনা করত।

গিল্ড বা নিগম প্রথার ফলে গণতন্ত্রবাদের উদ্ভব হয়েছিল। বাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য স্বল্প মজুরিতে ভাড়া শ্রমিক বা ক্রীতদাস নিয়োগ করা হত।

নিগম বা শিল্পগুলি অনেক সময় আধুনিক ব্যাঙ্কের কাজ করত। এরা সুদের বিনিময়ে বণিকদের অর্থ দিত। বহু সম্পদশালী ব্যক্তিরা শিল্পগুলিতে সুদের বিনিময়ে টাকা গচ্ছিত রাখত। ক্ষত্রপ নহপানের জামাতা ঋষভদত্ত গোবর্ধন নিগমে সুদের টাকা গচ্ছিত রাখেন। নাগার্জুনীকোণ্ড ও কাঞ্চীর বিহারগুলি সামুদ্রিক বাণিজ্যে উৎসাহ দেওয়ার জন্য মূলধন লগ্নী করত বলে জানা যায়।

• **সাতবাহন রাজাদের ধর্ম :** 'নাসিক প্রশস্তি' থেকে জানা যায় যে, সাতবাহন রাজারা গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তারা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সাতবাহন রাজাদের আমলে তৈরি কার্লে গুহা বৌদ্ধধর্মের জন্য উৎসর্গীকৃত করা হয়। সাতবাহন রাজারা বৌদ্ধধর্মের মহাসংঘীকা সম্প্রদায়কে সমর্থন করতো। কার্লে গুহা ছাড়া অমরাবতী, ঘণ্টাশাল প্রভৃতি স্থানে সাতবাহন রাজারা বৌদ্ধস্তূপ নির্মাণ করেন।

• **সাতবাহন যুগের সমাজব্যবস্থা :** সাতবাহন যুগে সমাজ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীতে ছিল মহাভোজ, মহারথী, মহাসেনাপতি ও সামন্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল অমাত্য, মহাপাত্র, বণিক ও শ্রেষ্ঠী প্রমুখ, তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল লেখক, বৈদ্য, কৃষক এবং চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল সূত্রধর, কর্মকার, মালাকার, স্বর্ণকার প্রমুখ। এ যুগে ভূমিকর, সীতাকর, লবণকর প্রভৃতি রাজস্ব হিসেবে সংগৃহীত হত। সাতবাহন যুগে প্রধান বন্দর ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর। এ যুগে কাবেরীপত্তনম পর্যন্ত বাণিজ্য চলতো। পূর্বের উল্লেখযোগ্য বন্দর হল কনুরা, কণ্টকশাল এবং আলেসিন্ন এবং কালিপাজ্ঞা, সোপারা, কল্যাণ, ভৃগুকচ্ছ বা ব্রোচ ছিল পশ্চিমের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। সাতবাহনদের বাণিজ্য চলতো মালয়, চিন ও চোল সাম্রাজ্যের সঙ্গে। সাতবাহন যুগে মুদ্রাকে বলা হত পোটিন মুদ্রা। সাতবাহন রাজারা সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ যুগে শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্' রচিত হয়। গুণাঢ্য সাতবাহন রাজার মন্ত্রী ছিলেন। এ যুগে কার্লে গুহাচৈত্য নির্মিত হয় এবং সাতবাহন নগরী জুন্নাকে ঘিরে ১৩৫টি গুহা তৈরী করা হয়।

9.6 স্থাপত্য শিল্প (Sculptural Art)

• **গান্ধার শিল্প :** ব্যাকট্রিও যুগ থেকে গান্ধার শিল্পের সূচনা হলেও কুষাণ যুগে এই শিল্প বিশেষ পরিণতি লাভ করে। ব্যাকট্রিও গ্রিকগণ খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে প্রায় ৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি শিল্পরীতির সূচনা করেন যা গান্ধার শিল্প নামে পরিচিত। কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক এই গান্ধার শিল্পের প্রতি গভীর অনুরক্ত ছিলেন। এই শিল্পের সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধধর্মের সম্পর্ক ছিল। এইজন্য এই শিল্পকে গ্রিক ও বুদ্ধিস্ট বলা হয়। ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে গান্ধার শিল্পের উৎপত্তি সম্পর্কে মতভেদ লক্ষ করা যায়। কুমারস্বামীর মতে, ভারতীয় শিল্পে গ্রিক শিল্পরীতির প্রয়োগের ফলে গান্ধার শিল্পের বিকাশ হয়। অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী ও জন মার্শাল প্রমুখ গান্ধার শিল্পে গ্রিক প্রভাব বড় করে দেখেছেন। কিন্তু নিছক গ্রিকশিল্প বলতে যা বোঝায় গান্ধার শিল্প তা ছিল না। ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম ও গ্রিক শিল্পরীতির মিলনে গান্ধার শিল্পের উদ্ভব হয়। এই শিল্পের প্রথম নিদর্শন শক-পার্থিব রাজা প্রথম এ্যজেসের রাজত্বকালেই পাওয়া যায়। কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের আমলে এই শিল্পের পূর্ণবিকাশ ঘটে। শক ও কুষাণরা ভারতে এসে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলে তাঁদের শিল্প-ভাবনায় বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটে। বুদ্ধের মূর্তি, বোধিসত্ত্ব, মায়াদেবী প্রমুখের মূর্তি গান্ধার শিল্পরীতিতে নির্মিত হতে থাকে। গান্ধার শিল্পের বৈশিষ্ট্য হল গ্রিক অ্যাপোলো দেবতার অনুকরণে বুদ্ধের মূর্তি তৈরি করা, মূর্তিতে গ্রিক দেবতার পৌরুষ ও তাঁর মাংসপেশী, উন্নত গ্রীবা, কুঞ্চিত কেশ, খোলা কেশ প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়। ভারতীয় রীতি অনুসারে প্রশান্ত মুখমণ্ডল অর্থাৎ গ্রিক দৈহিকতার সঙ্গে যুক্ত হয় ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা। তবে কখনও কখনও স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মূর্তিগুলিতে গোঁফ বা পাগড়ি পরানো হত। পাথর, চুনা, বালি বা প্লাস্টার অফ প্যারিস, পোড়ামাটি দিয়ে গঠিত মূর্তিগুলির উপর সোনালি বা অন্য রঙের গাঢ় প্রলেপ দেওয়া হয়। যক্ষ, গরুড় প্রভৃতির মূর্তি গ্রিক দেবতা জিউস বা ব্যাকাস প্রমুখের অনুকরণে তৈরী করা হত। জন মার্শালের মতে, গান্ধার শিল্প ছিল অনুকরণের অনুকরণ। অর্থাৎ গান্ধার শিল্প ছিল ঔপনিবেশিক শিল্পের অনুকরণ। এ জন্য ভারতের মূলশিল্পের উপর তা কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিল্পের অনুরাগী শিল্পীদের মতে, গান্ধার শিল্প ছিল প্রথম সার্থক ভারতীয় শিল্প। গান্ধার শিল্পীরাই প্রথম গৌতম বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ করেন। গান্ধার অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ স্তূপকীর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। এর মধ্যে পেশোয়ার, তখত-ই-বাহি, জামালগোড়ি, তক্ষশিলা, মানিকিয়ালা প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ স্তূপকীর্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ দেবলমিত্রের ভাষায় মূর্তিগুলির বহিরঙ্গ বিদেশী হলেও আত্মা ভারতীয়।

• **মথুরা শিল্প :** উত্তর ভারতের মথুরা নগরী প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ মথুরা নগরীতে শিল্পের বিকাশ অতি প্রাচীনকালে হলেও কুষাণ যুগে তা উৎকর্ষতা লাভ করে। গান্ধার শিল্পের সমসাময়িক হলেও মথুরা শিল্প ছিল সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়। ভারতে আর্য-অনার্য শিল্প সংমিশ্রণে যা ধারা প্রচলিত ছিল মথুরা শিল্প তাই পরিণতি লাভ করে বলে অনেকে মনে করেন। মথুরা শিল্পের নিদর্শন মথুরা শহর সারনাথ, শ্রাবস্তী ও কৌশাম্বীতেও পাওয়া গেছে। এই স্থানগুলিতে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির বৈশিষ্ট্য হল বিশালতা ও স্থূলতা। গৌতমবুদ্ধ বোধিসত্ত্বের মূর্তিগুলি ছাড়াও জৈন তীর্থঙ্কর ও যক্ষের মূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল একটি বোধিসত্ত্বের মূর্তি যার উচ্চতা ১০ ফুট ও প্রস্থ ৩ ফুট। মূর্তিটি কুষাণরাজ কণিষ্কের আমলে নির্মিত। ঠিক একই ধরনের আরেকটি বোধিসত্ত্বের মূর্তি পাওয়া যায় কৌশাম্বীতে।

মথুরা শিল্পে বোধিসত্ত্বের মূর্তিগুলি দণ্ডায়মান, আকৃতিতে গোল, মস্তক মুণ্ডিত, দেহের উপরের অংশ কিছুটা আবৃত, নিম্নাঙ্গ বস্ত্রশোভিত ও কোমরে কোমরবন্ধনী। গৌতম বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি ছাড়াও শিল্পে মহাবীরসহ অন্যান্য তীর্থঙ্করদের নগ্নমূর্তি গুরুত্ব পেয়েছে।

শুধুমাত্র ধর্ম সম্পর্কিত নয় ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয়েও মথুরা শিল্প স্থান পেয়েছে। মথুরা শিল্পরীতিতে তৈরি মস্তকহীন কনিষ্কের একটি দণ্ডায়মান মূর্তি পাওয়া যায়। মথুরা শিল্প ভারতীয় ভাবধারা দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত ছিল। মধুরা শিল্পের উপর গান্ধার শিল্পের প্রভাব কিছুটা থাকলেও তা মথুরা শিল্পের মৌলিক চরিত্রকে পরিবর্তন করতে পারেনি বলে শিল্পী বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

অমরাবতী শিল্প : দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণা ও গোদাবরীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে অমরাবতীকে কেন্দ্র করে এক শিল্পরীতি গড়ে উঠে। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে গড়ে ওঠা এক শিল্প সাতবাহন রাজাদের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। নাগার্জুন কোণ্ডা, গোলি, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে এই শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, অমরাবতী শিল্পরীতিতে সৃষ্ট মূর্তিগুলি সামগ্রিকভাবে দর্শকদের মুগ্ধ করে না। নাগার্জুন কোণ্ডাতে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য গৌতম বুদ্ধের মূর্তি বেঙ্গিশিল্পে তার স্থান করে নেয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে নাগার্জুন কোণ্ডায় স্তূপ, চৈত্য ও বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। উত্তর ভারতের শিল্পরীতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হলেও অমরাবতী বা বেঙ্গিশিল্প দীর্ঘদিন তার নিজস্বতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।